ব্যাংক কেলেঙ্কারি বা লুণ্ঠনের মেগাসিরিয়াল : প্রেক্ষাপট, প্রবণতা ও পদ্ধতি

কল্লোল মোস্তফা

ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন এখন খুব নিয়মিত ঘটনা। কখনও ব্যবসা ও শিল্পের ঋণের নামে, কখনও সরাসরি জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এই ব্যাংক লুণ্ঠনের ঘটনাগুলো ঘটছে। মেগাসিরিয়ালের বিভিন্ন পর্বের মত গত এক দশকে হলমার্ক, বিসমিলাহ গ্রুপ, বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, ফারমার্স ব্যাংক ইত্যাদি বহু ব্যাংক কেলেঙ্কারির খবর একের পর এক গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই সব লুটপাটকে কোনভাবেই স্রেফ কেলেঙ্কারি বলা যায় না; এটা হল জনগণের অর্থ লুট করে পুঁজিপতি তৈরির ধারাবাহিক ম্যাকানিজম। এই প্রবন্ধে লুণ্ঠনের এই ধারাবাহিকতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা লুটের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন শুরু হয়, এরপর সামরিক শাসন আমলে লুটেরা কোটিপতি তৈরির প্রক্রিয়া চালু থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা পানির দরে বিক্রি করা, শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ দিয়ে 'ঋণখেলাপি সংস্কৃতি'র বিকাশের মাধ্যমে। সে সময় ঋণখেলাপি প্রবণতার ওপর করা এক গবেষণায় বিনায়ক সেন ও রেহমান সোবহান দেখিয়েছিলেন, শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা থেকে শিল্প উন্নয়নের জন্য নেয়া ঋণের একটা অংশ যন্ত্রপাতি আমদানির নামে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে এবং আরেকটা অংশ দেশের ভেতরে রিয়েল এস্টেট ও বিলাসী জীবন যাপনের পেছনে খরচ করা হয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের কাছে শুধুমাত্র শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থার খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৯.৯ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ১৯৮৭ সাল নাগাদ ১০ গুণ বেড়ে হয় ৮৭৪.৩ কোটি টাকা। এ সময় মোট খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় ২ হাজার কোটি টাকা।[১] এই বিপুল পরিমাণ অনাদায়ি ঋণের কারণে নতুন উদ্যোক্তারা তহবিল সংকটে পড়লেও ঋণখেলাপিদের কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়নি। বিনায়ক সেন ও রেহমান সোবহানের ভাষায়, "বাংলাদেশে বিনিয়োগ ব্যাংকের ঋণখেলাপিরা তাঁদের বিলাসবহুল বাড়িতে থাকতে পারেন, গাড়ির বহর নিয়ে চলতে পারেন, বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন, নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে পারেন, সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণও নিতে পারেন। ঋণ খেলাপের জন্য তাঁর ওপর কোন আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয় না। এমনকি মামলা আদালতে উঠলে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কোন ঋণও পরিশোধ করতে হয় না।"[২]

এ বিষয়ে ১৯৮১ সালের দিকে আনু মুহাম্মদ লিখেছিলেন : "১৯৭২ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রতিকূল শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে, যার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সকল ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কিছু ব্যক্তির কালো টাকার মালিক হওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাংকে জমাকৃত জনগণের টাকা পরজীবী শ্রেণিগুলোর বিশাল বিত্ত বানানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।"[৩] ব্যাংক ঋণের গন্তব্য বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাতে তিনি লিখেছিলেন[৪] :

- দেশের ৫টি ব্যবসায়ী গ্রুপ বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে। এদের ভূমিকা গডফাদারের মত।
- বেসরকারি খাতের জন্য মোট বরাদ্দকৃত ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ এই কয়টি গ্রুপ ভোগ করে।
- লন্ডনভিত্তিক ব্যবসারত একটি কোম্পানি মাত্র ৪ হাজার পাউন্ড মূল্যের একটি ফ্যাক্টরি দেখিয়ে প্রায় সোয়া দুই লাখ পাউন্ড পরিমাণ ঋণ ভোগ করছে। এর পরও প্রদত্ত ঋণের প্রকৃত সুদের একটি অংশ মওকুফ করে দেয়া হয়েছে।
- একজন কোটিপতি শিল্প প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মাত্র কিছুদিন আগে গুলশানে একটি বাড়ি এবং অন্যত্র একটি হোটেল নির্মাণ করেছেন। মর্টগেজ দেয়া কারখানায় যন্ত্রপাতি নেই, যা আছে তাতে ঋণের চার ভাগের এক ভাগও আদায় হবে না।
- কিছুদিন আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঢাকাস্থ শাখা থেকে কয়েক লাখ টাকা ঋণ নিয়ে একজন ব্যবসায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত একটি কারখানা ক্রয় করেন এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাঁর সকল সরঞ্জাম প্রায় দ্বিগুণ দামে আরেক পার্টির কাছে বিক্রি করেন।
- কোন সুনির্দিষ্ট জামানত না দেখিয়ে এক ব্যক্তি কিছুদিন আগে দেড় কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। এই ঋণ নেয়ার পর টাকাসহ তিনি পাড়ি জমিয়েছেন লন্ডনে।

১৯৮৫ সালের শেষের দিকে আনু মুহাম্মদের আরেকটি লেখায় আমরা দেখি: "১৯৮৪-৮৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শত শত কোটি টাকা কয়েকটি পরিবারের কাছে অনাদায়ি থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। যাঁরা ব্যাংক ঋণ এভাবে অনাদায়ি রেখেছেন তাঁদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই তদন্তে দেখা গেছে, যে শিল্প কারখানার নামে তাঁরা ঋণ নিয়েছেন সেগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই। দেশের মাত্র ৫টি ব্যাবসায়িক গ্রুপ গডফাদারের মত ব্যাংকগুলোকে ইচ্ছেমত নিজেদের কাজে ব্যবহার করে।... ...এদেরই বেশ কয়েকজন দুটি বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮২ সালে সিটি ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক লি.। তা ছাড়া বিদেশিদের সঙ্গে যৌথভাবে এদেরই কয়েকজন প্রতিষ্ঠা করে আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি. এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন–আইএফআইসি। এক তথ্যে দেখা যায়, এযাবৎ প্রতিষ্ঠিত ৬টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংকের ১৫ জন ডিরেক্টর নিজেদের বা তাঁদের ব্যবসার নামে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে ধার নিয়েছেন কয়েক শ কোটি টাকা। অথচ এই সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের মোট মূলধনই হল মাত্র ৪৮ কোটি টাকা; এঁদের কাছে শুধু শিল্প ব্যাংকেরই মেয়াদ উত্তীর্ণ পাওনা হচ্ছে ১৩১ কোটি টাকা।"[৫]

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব কতিপয় বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে ব্যাংক ঋণ কুক্ষিগত হওয়া, বিনা জামানতে বা নামমাত্র জামানতে ঋণ দেয়া, শিল্পের নামে ঋণ নিয়ে আমদানি-রপ্তানি, রিয়েল এস্টেটের কাজে

লাগানো বা বিদেশে পাচার করে দেয়া, ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক হওয়ার যে প্রবণতা '৭০-৮০-র দশকে বিশেষত সামরিক শাসনামলে দেখা গেছে, তা পরবর্তীকালে দিনে দিনে আরও বিকশিত হয়েছে। পরবর্তী 'গণতান্ত্রিক' আমলের কৃতিত্ব হল এই শত কোটি টাকার লুণ্ঠনকে ক্রমান্বয়ে হাজার কোটি টাকার স্কেলে উন্নীত করা। ২০০২-০৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা থেকে দেখা যায়, "১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৯৫৩ কোটি টাকা, যা ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ১২,২২৭ কোটি টাকায়"[৬], যা বছর বছর কেবল বাড়ছেই। সর্বশেষ ২০১৮ সালের মার্চে খেলাপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা। এর সাথে অবলোপন করা ৪৮ হাজার ১৯২ কোটি টাকা যোগ করলে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা।[৭]

এ রকম একটা প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমরা যদি গত এক দশকের ব্যাংক লুটের ঘটনাগুলো বিশেষণ করি তাহলে অতীতের কয়েক কোটি বা কয়েক শ কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনাগুলোকে হাল আমলের হলমার্ক, বিসমিলাহ, বেসিক কিংবা যমুনা ব্যাংক লুটপাটের তুলনায় কিছুই মনে হবে না! গত এক দশকের ব্যাংক লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে যেসব কমন বা সাধারণ কতগুলো প্রবণতা ও পদ্ধতি শনাক্ত করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সরাসরি জালিয়াতির মাধ্যমে লুণ্ঠন, ঋণ নিয়ে ব্যবসার পুঁজি গঠন, ঋণ খেলাপ ও লুটপাট, ব্যাংক মালিক হয়ে লুটপাট অর্থাৎ স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে জনগণের হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন, ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক এবং পরবর্তীতে আরো লুটপাট, চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক মদদে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক ঋণ ও লুটপাট, ব্যাংক লুটে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা, যেমন–অনিয়ম দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদান, লুণ্ঠনের হোতাদের বিচার না করা, খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার না করা, উদারভাবে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান, বছর বছর জনগণের করের অর্থ লুটপাটের শিকার ব্যাংকগুলোতে ঢালা ইত্যাদি।

কতিপয় বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে ব্যাংক ঋণ কুক্ষিগত হওয়া, বিনা জামানতে বা নামমাত্র জামানতে ঋণ দেয়া, শিল্পের নামে ঋণ নিয়ে আমদানি-রপ্তানি, রিয়েল এস্টেটের কাজে লাগানো বা বিদেশে পাচার করে দেয়া, ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক হওয়ার যে প্রবণতা '৭০-৮০-র দশকে বিশেষত সামরিক শাসনামলে দেখা গেছে, তা পরবর্তীকালে দিনে দিনে আরও বিকশিত হয়েছে। পরবর্তী 'গণতান্ত্রিক' আমলের কৃতিত্ব হল এই শত কোটি টাকার লুণ্ঠনকে ক্রমান্বয়ে হাজার কোটি টাকার স্কেলে উন্নীত করা।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এই সব প্রক্রিয়ায় দিনের পর দিন ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে জনগণের অর্থ লুণ্ঠন করা সম্ভব হত না। এই ব্যাংক লুণ্ঠনগুলো যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা কেলেঙ্কারি নয়, বরং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর শ্রেণি চরিত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদগুলো বিচার-বিশেষণ করলেও বোঝা যায়। এখানে দৈনিক প্রথম আলো, বণিক বার্তা, সমকাল, কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউনসহ মূলধারার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত 'ব্যাংক কেলেঙ্কারি' সম্পর্কিত সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে ব্যাংক লুটের প্রেক্ষাপট, প্রবণতা ও পদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসার পুঁজি গঠন ও লুটপাট

বাংলাদেশে ব্যবসা বা শিল্পের জন্য প্রাথমিক পুঁজি গঠনের সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি বোধ হয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে এবং ব্যাংক পরিচালক/কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে জামানত ছাড়া/স্বল্প জামানত দিয়ে ঋণ গ্রহণ এবং তারপর ঋণখেলাপি হয়ে যাওয়া! এরপর বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে ঋণ পুনর্গঠন, মামলা, তদন্ত, রিট ইত্যাদি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এ রকম লুটপাটের বিভিন্ন খবর প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে গত এক দশকে এই প্রবণতা উলেখযোগ্য হারে বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ এ্যাননটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউনুছ বাদলের উত্থানের কথাই ধরা যাক। ১০ বছর আগেও অভিযোগ ছিল, গাড়িচোর চক্রের নেতা তিনি। ২০০৭ সালে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিলেন। এর ঠিক তিন বছর পর থেকে তিনি আবির্ভূত হন জনতা ব্যাংকের অন্যতম বড় ঋণগ্রাহক হিসেবে। সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক তাঁকে ছয় বছরে দিয়েছে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকার ঋণ ও ঋণসুবিধা, যার ফলে আজ তিনি বড় শিল্পপতি, ২২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক। জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ছাড়াও ইউনুছ বাদল পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন একাধিক মন্ত্রী, ব্যাংকের কর্মকর্তা ও ব্যাংকের সিবিএ নেতাদের।[৮]

একসময় ছোট পরিসরে ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা করতেন বগুড়ার টিপু সুলতান। ঢাকা ট্রেডিং হাউজের নামে সীমিত পরিসরে পণ্য আমদানি করতেন তিনি। ২০০৯ সাল থেকে অপ্রত্যাশিত উত্থান হয় তাঁর। জনতা, রূপালী, বিডিবিএল, এবি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকসহ ডজনখানেক ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিবহন ব্যবসায় নামেন। ঢাকা ট্রেডিং হাউজ লিমিটেড, টিআর স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ এবং টিআর ট্রাভেলসের নামে ব্যাংকগুলো থেকে এই ঋণ নিয়েছিলেন টিপু সুলতান, যার প্রায় পুরোটাই এখন খেলাপি। এর মধ্যে অধিকাংশ ঋণই দেয়া হয়েছে জামানত ছাড়া। টিপু সুলতানের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের সম্ভাবনাও খুব কম।[৯]

হলমার্ক কেলেঙ্কারির নায়ক তানভীর মাহমুদের বাবা নুরুল ইসলাম ছিলেন গ্রামের সাধারণ কৃষক, পরে শুরু করেন তৈজসপত্রের ব্যবসা। একসময় বাবার ব্যবসায় যুক্ত হন বড় ছেলে, খুচরা ব্যবসাটি রূপ নেয় পাইকারি ব্যবসায়। কিছুদিন পর বাবার ব্যবসা থেকে পুঁজি নিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান তানভীর। ঢাকায় গিয়ে তৈরি পোশাক কারখানায় কাপড়ের কার্টন সরবরাহের কাজ নেন তিনি। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী বনে যান তানভীর মাহমুদ।[১০] এভাবে অল্প সময়ে বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পেছনে রয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবে নেয়া ব্যাংক ঋণ: "বহু বিতর্কিত হলমার্ক গ্রুপের উত্থান বিস্ময়কর। তাদের দেয়া তথ্যেই আছে, ১৯৯৪ সালে হলমার্ক প্যাকেজিং নামের কার্টন তৈরির একটি কারখানা ছিল নামমাত্র। এর এক দশক পর ২০০৪ সালে সোনালী ব্যাংকের টাকা দিয়ে গড়ে তোলা হয় হলমার্ক ফ্যাশন নামের একটি গার্মেন্ট কারখানা। তারপর শুধুই সামনের দিকে দৌড়ানো। হলমার্ক গ্রুপের কর্ণধার তানভীর মাহমুদ ব্যাংক থেকে ভুয়া কাগজপত্রে নেয়া আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করা শুরু করেন

দেদার। তাঁর ভাবনায় ছিল, যেহেতু ঋণের সবই ভুয়া, তাই ব্যাংকের টাকা আর ফেরত দিতে হবে না। এভাবে মাত্র আট বছরে কাগজে-কলমে ৮৪টি কারখানা গড়ে তোলেন তিনি। এর মধ্যে ৩৫টি কারখানা সচল, বাকি সব কাগুজে।"[১১]

বস্তুত প্রতিনিয়তই ব্যাংকিং খাতে এ ধরনের লুটপাট ঘটতে থাকে। দেশের শাসক শ্রেণির চরিত্র, পুঁজি গঠনের ধরন, আর্থিক খাত ও ব্যাংকিং সেক্টরের গঠন ইত্যাদি কারণে এ রকম ঘটাই স্বাভাবিক। এসব লুটপাট ঘটতে ঘটতে যখন আর ধামাচাপা দেয়ার উপায় থাকে না তখন কিছু কিছু ঘটনা গণমাধ্যমে চলে আসে। একদিকে কতিপয় লুটেরা পুঁজিপতি 'চাহিবা মাত্র' হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ পেয়ে যায়, ঋণ পরিশোধ না করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে উল্টো সহজ শর্তে ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ দেয়া হয়, অন্যদিকে সামান্য কিছু টাকা ঋণের অভাবে বহু পরিশ্রমী খুদে উদ্যোক্তা দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে। ক্ষমতা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার আলাদীনের চেরাগ ছাড়া ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া কত দুরূহ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সর্বজনের ব্যাংক থেকে ঋণের নামে হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে গ্রুপ অব কোম্পানিজ গড়ে তোলার সমালোচনা করলেই অজুহাত হিসেবে বলা হয় হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃজনের কথা। যেন ব্যাংক লুট ছাড়া মানুষের কর্মসংস্থান করার আর কোন উপায় নেই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে ব্যাংক লুট করতেই হবে! গ্রুপ অব কোম্পানিজ প্রেমিকরা এই কথা বলবে না বা স্বীকার করবে না যে জনগণের অর্থে এই সব লুটেরা গ্রুপ অব কোম্পানিজ লালন-পালন করতে গিয়ে কত লাখো কোটি মানুষের রুটিরুজি নষ্ট করা হচ্ছে!

> অভিযোগ ছিল, গাড়িচোর চক্রের নেতা তিনি। ২০০৭ সালে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিলেন। এর ঠিক তিন বছর পর থেকে তিনি আবির্ভূত হন জনতা ব্যাংকের অন্যতম বড় ঋণগ্রাহক হিসেবে। সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক তাঁকে ছয় বছরে দিয়েছে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকার ঋণ ও ঋণসুবিধা

ঘুষ, দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে লুণ্ঠন

কখনও নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণপত্র (এলসি) খুলে, কখনও ভুয়া আমদানি-রপ্তানির হিসাব দেখিয়ে, ব্যাংকের পরিচালক বা ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগসাজশ করে ঋণের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে এ ধরনের লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটলেও বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রেও এ ধরনের জালিয়াতি ঘটে থাকে।

কুখ্যাত হলমার্ক গ্রুপ এভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখা থেকে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়ে যায়। এর ৭০-৮০ ভাগই নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানীয় ঋণপত্র (এলসি) খুলে অর্থ বের করে নেয়া হয়। কিছু ছিল শিল্পের যন্ত্রপাতি ও চলতি মূলধন জাতীয় ঋণ। ২০১২ সালের ২৮ মার্চ হলমার্ক গ্রুপ রূপসী বাংলা শাখায় সুতা কিনতে তিনটি প্রতিষ্ঠান–আনোয়ারা স্পিনিং মিলস, ম্যাক্স স্পিনিং মিলস ও স্টার স্পিনিং মিলসের অনুকূলে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার স্থানীয় ঋণপত্র খোলে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তিনটিও একই শাখার গ্রাহক। একই দিনে এই এলসির অর্থ পরিশোধে নিশ্চয়তা (অ্যাকসেপট্যান্স) দেয় হলমার্ক। এর বিপরীতে একই শাখা তিন প্রতিষ্ঠানের (অ্যাকসেপট্যান্স বিল কিনে নিয়ে) হিসাবে টাকা জমাও করে দেয়। এলসির প্রক্রিয়াটি কাগজপত্রের হলেও নির্ধারিত অংশ জমা রেখে (মার্জিন) ব্যাংক তিন কোম্পানির হিসাবে টাকা জমা করে দেয়। এর কয়েক দিন পর এই তিন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরো টাকাই হলমার্ককে দিয়ে দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যাংকও এই তিন প্রতিষ্ঠানের হিসাব থেকে অর্থ কেটে হলমার্কের হিসাবে জমা করে দেয়।[১২]

অন্যদিকে টেরিটাওয়েল (তোয়ালেজাতীয় পণ্য) উৎপাদক বিসমিল্লাহ গ্রুপ দেশের পাঁচটি ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। এই কাজে হলমার্কের মতই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের খোলা স্থানীয় এলসি (ঋণপত্র) দিয়ে আরেক (এটাও নিজস্ব) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নিয়ে বিল তৈরি করে তা ব্যাংকে জমার মাধ্যমে অর্থ বের করে নেয়া হয়। এ ছাড়া ভুয়া রপ্তানি দেখানো, বিদেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার মাধ্যমে অতিমূল্যায়ন করে বাংলাদেশ থেকে আমদানি এবং এর মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে সরকারের দেয়া নগদ সহায়তা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। বিসমিলাহ গ্রুপের এই ঋণ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত রয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনতা, বেসরকারি প্রাইম, শাহজালাল, প্রিমিয়ার, যমুনা ও সাউথইস্ট ব্যাংক।[১৩]

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির নামে বিভিন্ন উপায়ে ঋণের নামে রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বের করে নেয় ক্রিসেন্ট লেদার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ক্রিসেন্ট লেদারের মালিকানাধীন ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্ট, রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যারস, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ, রিমেক্স ফুটওয়্যার এবং লেক্সকো লিমিটেড নামের পাঁচটি প্রতিষ্ঠান থেকে চীন, ইতালি, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশে রপ্তানি দেখানো হয়। এসব রপ্তানির বিপরীতে সৃষ্ট ফরেন ডকুমেন্টারি বিল ক্রয় (এফডিবিপি) করে জনতা ব্যাংক। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক পরিদর্শনে নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে এফডিবিপির বিপরীতে ১১৩৫ কোটি টাকা দেয়ার তথ্য উঠে আসে। রপ্তানির ১২০ দিনের মধ্যে এসব বিলের অর্থ ফেরত আনার নিয়ম থাকলেও ক্রিসেন্টের ক্ষেত্রে তা আসেনি। ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে ধারাবাহিকভাবে রপ্তানির অর্থ না এলেও বিল কেনা বন্ধ করেনি ব্যাংক।[১৪]

এসব জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যাল ও পরিচালকরা ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে খুশি করতে ঋণ অনুমোদনের কোন নিয়মকানুন, যাচাই-বাছাইয়ের তোয়াক্কা করেন না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংকের প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারির পেছনে সরকার গঠিত পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিচালনা পর্ষদ আইন বিধিমালা ইত্যাদি কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি, ইচ্ছামত হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এমনকি প্রধান কার্যালয়ের ঋণ যাচাই কমিটি বিরোধিতা করলেও পর্ষদ ঠিকই ঋণের অনুমোদন দিয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পরিচালনা পর্ষদের ঋণ বিতরণে এই 'উদারতার' পেছনে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুর ভূমিকা ছিল মুখ্য।[১৫]

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়েই যে শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু এই লুণ্ঠনে ভূমিকা রেখেছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ বিষয়ে গণমাধ্যমে বিস্তারিত রিপোর্টও বের হয়েছে। ২০০৯

সালের সেপ্টেম্বরে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন তিনি। আর ইডেন ফিশারিজ নামে জাহাজ কোম্পানি খোলেন পরের বছরের ডিসেম্বরে। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা আসন) মাহজাবীন মোরশেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের এফভি ক্রিস্টাল-১ ও এফভি ক্রিস্টাল-২ নামের দুটি জাহাজের মালিকানা ২০১২ সালের ৫ জুন ইডেন ফিশারিজের নামে স্থানান্তর করা হয়। লক্ষণীয় হল, সাংসদ মাহজাবীন এবং তাঁর স্বামী চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক সভাপতি মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিমের কাছে বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা।[১৬]

ব্যাংক মালিক হয়ে ব্যাংক লুটপাট

ব্যাংক আর দশটা প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মত নয়। একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে মোটামুটি ৪০০ কোটি টাকা পেইড-আপ ক্যাপিটাল লাগে। যাঁরা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা এই টাকাটা বিনিয়োগ করেন। এরপর এই ব্যাংকে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ হাজার হাজার কোটি টাকা আমানত রাখে। ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যাংক পরিচালকরা এই হাজার হাজার কোটি টাকার আমানত নিয়ন্ত্রণ করেন, কোথায় বিনিয়োগ করবেন, কাকে ঋণ দেবেন তার সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠনের জন্য প্রথমে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কাজে লাগিয়ে ব্যাংকের লাইসেন্স নেয়া হয়, তারপর ব্যাংকে জমা পড়া জনগণের আমানত ঋণ দেয়ার নামে লুটপাট করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন :

"ব্যাংক মালিকদের দ্রুত ধনশালী হয়ে ওঠা এবং জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা যাক। এটি ব্যাংকের মুনাফা থেকে হয় না, যদিও ব্যাংকের মুনাফার হার আকর্ষণীয়। বিষয়টি বুঝতে হলে ব্যাংকের পরিচালনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি ব্যাংকের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মাত্র ১০ শতাংশ সব মালিক বা শেয়ারহোল্ডার মিলে পরিশোধিত মূলধন হিসেবে দিয়ে থাকেন। বাকি ৯০ শতাংশ জনগণের আমানত থেকে সংগৃহীত। প্রকৃত অর্থে জনগণের টাকায় ব্যাংক চলে, কিন্তু ব্যাংক পরিচালনায় আমানতকারীর অংশগ্রহণ নেই, বোর্ডে তাদের কোনো পরিচালক নেই। এ সুযোগেই জনগণের অর্থ ব্যবহার করে মালিক-পরিচালকরা ফুলেফেঁপে ওঠেন। উন্নত দেশে পরিচালকদের নীতি নির্ধারণ ছাড়া পরিচালনায় কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। বাংলাদেশে এসবের বালাই নেই। ব্যাংক পরিচালকরা সব অর্থেই মালিক ও পরিচালনাকারী বনে যান। জনগণের ৯০ শতাংশ অর্থ পরিচালকরা নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করেন।"[১৭]

উদাহরণস্বরূপ ফারমার্স ব্যাংকের আমানত লুণ্ঠনের কথা বলা যায়। মোট ৩৯ জন ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও ১২টি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগে ৪০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২০১৩ সালে যাত্রা করে ফারমার্স ব্যাংক। ব্যাংকের মোট ৪০ কোটি ১৬ লাখ ১০ হাজার শেয়ারের মধ্যে ৩৯ জন ব্যক্তি উদ্যোক্তার শেয়ার ২৯ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার। প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা হিসেবে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ রয়েছে ২৯৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা, যা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের ৭৩.১১ শতাংশ। বাকি ১২ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর মূলধন ১০৮ কোটি টাকা। ব্যাংকটির প্রভাবশালী উদ্যোক্তার মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ডের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো. মাহবুবুল হক বাবুল চিশতী, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের মেয়ে নাফিসা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন), বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, লুসাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান সরকার, মোহাম্মদ মাসুদ, আজমত রহমান, ড. মোহা. আতাহার উদ্দিন ও অমিকন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মো. মেহেদী হাসান।[১৮]

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে ফারমার্স ব্যাংক। আস্থার সংকট তৈরি হলে আমানতকারীদের অর্থ তোলার চাপ বাড়ে। পরিস্থিতির অবনতির পর ব্যাংকটির পরিচালক পদ ছাড়তে বাধ্য হন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতী। তত দিনে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ৪০০ কোটি টাকা নিয়ে কার্যক্রমে আসা ব্যাংকটি ২৮৩ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে পড়ে। ২০১৭ সালে ৫৩ কোটি টাকা নিট লোকসান করে ফারমার্স ব্যাংক। বছর শেষে ব্যাংকটির আমানত কমে হয় ৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। অথচ ব্যাংকটির ঋণ ৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। আমানতের চেয়ে ঋণ বেশি হওয়ায় ফারমার্স ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা ফেরত প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে নানা অনিয়ম করে দেয়া ঋণও আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১৯]

> কুখ্যাত হলমার্ক গ্রুপ এভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখা থেকে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়ে যায়। এর ৭০-৮০ ভাগই নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানীয় ঋণপত্র (এলসি) খুলে অর্থ বের করে নেয়া হয়।

ঋণ সুবিধা দিয়ে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ১৪৫ কোটি টাকা ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠে ফারমার্স ব্যাংকের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতীর বিরুদ্ধে। বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রাহকের হিসাব থেকে নগদ অর্থ ও পে অর্ডারের মাধ্যমে ওই টাকা চিশতীর মালিকানাধীন বখশীগঞ্জ জুট স্পিনার্স মিলের হিসাবে জমা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তিনি ব্যাংকে কৃত্রিম ও ভুয়া ঋণ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে শেয়ার কিনেছেন। এ ছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন গ্রাহককে ঋণসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন।[২০]

ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংকমালিক ও পরবর্তীতে আরো লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। উদাহরণ স্বরুপ ক্রিসটাল গ্রুপের মালিক মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিমের কথা বলা যায়। এক দশক আগে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইব্রাহিম কটন মিল বিক্রি করে গড়ে তোলেন ক্রিস্টাল গ্রুপ নামে নতুন প্রতিষ্ঠান। এরপর বিভিন্ন ব্যাংক থেকে একের পর এক ঋণ নিতে থাকেন। সেসব ঋণের অর্থ ফেরত না দিয়ে উল্টো বিভিন্ন ব্যাংকের মালিকনা অর্জন করেছেন। অনিয়ম-দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিম। ব্যাংকটির এক কোটি শেয়ার বা ২ দশমিক ৪৯ শতাংশ মালিকানা রয়েছে তার হাতে। ভাইয়ের স্ত্রীকে বানিয়েছেন এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের উদ্যোক্তা। এছাড়া ২০১৩ সালে অনুমোদন পাওয়া প্রটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ৬০ শতাংশ শেয়ারের মালিক হয়েছেন মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিমের পরিবারের সদস্যরা। এর চেয়ারম্যান

হিসেবে রয়েছেন তার ভাই রাশেদ মুরাদ ইব্রাহিম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে নেয়া টাকাই ব্যাংক-বীমায় বিনিয়োগ করেছে পরিবারটি।[২১]

ব্যাংকের মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে ঋণের নামে জনগণের আমানতের অর্থ লুণ্ঠন করা হয়, তার একটি বড় দৃষ্টান্ত হল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এস আলম গ্রুপের হাতে ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা আসার মাত্র ১৫ মাসের মাথায়ই তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ে যায় ব্যাংকটি। মালিকানা পরিবর্তনের আগমুহূর্তেও ব্যাংকটিতে ১০ হাজার কোটি টাকার মত বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পর তারা যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করেছে, ঋণ দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ২০১৭ সালের শুরুতে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৬৭ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা এবং ঋণ ৬১ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা। ওই সময় ব্যাংকটির ইসলামিক বন্ডে বিনিয়োগ ছিল ৫ হাজার ২০৭ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের শুরুতে আমানত বেড়ে হয় ৭৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকা এবং ঋণ বেড়ে হয় ৭০ হাজার ৯৯ কোটি টাকা। এরপর ২০১৮ সালের শুরু থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত আমানত বেড়ে হয় ৭৬ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা এবং ঋণ বেড়ে হয় ৭৪ হাজার ৪১৪ কোটি টাকা। আর এই সময়ে ইসলামিক বন্ডে থাকা বিনিয়োগও শূন্য করে ফেলে ব্যাংকটি। ইসলামিক বন্ডে থাকা ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি তুলে এনে টাকার সংকট মেটায় ব্যাংকটি। টাকার অভাবে ঋণ দেয়ার কার্যক্রম ছোট করে আনতে বাধ্য হয় ব্যাংকটি।[২২]

ব্যাংক পরিচালকদের পারস্পরিক যোগসাজশে ঋণ লুণ্ঠন

বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কোন ব্যাংক পরিচালক তাঁর মোট শেয়ারের ৫০ শতাংশের বেশি ঋণ নিজ ব্যাংক থেকে নিতে পারবেন না।[২৩] স্বনামে নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার এই 'অসুবিধা' দূর করতে তাঁরা একদিকে বেনামে আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, অন্যদিকে পারস্পরিক যোগসাজশে ও সমঝোতার মাধ্যমে অন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ লুণ্ঠন করেন। ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষিত হলে এঁরা আদালতের রিট আদেশ নিয়ে নিজেদের খেলাপি হওয়া দেখানো থেকে বিরত রাখার সুযোগ পান এবং ব্যাংকের পরিচালক পদে থেকে নতুন নতুন ঋণ গ্রহণ করতে থাকেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাক:
বিএনএস গ্রুপের কর্ণধার এম এন এইচ বুলু। তাঁর গ্রুপের সাতটি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) পাওনা ৩৯৫ কোটি টাকা, যা বর্তমানে খেলাপি। আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে বুলু এখন ঢাকা ব্যাংকের পরিচালক। এর পরও ঝুঁকি নিয়ে সম্প্রতি বুলুর প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১৩০ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে ন্যাশনাল ব্যাংক।[২৪]

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আমির হোসেনের নামে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে থাকা শেয়ারের প্রকৃত মালিক রতনপুর গ্রুপের কর্ণধার মাকসুদুর রহমান। সেই শেয়ার বন্ধক রেখে আমির হোসেনকে ২৫ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক। আমির হোসেনের নামে সৃষ্ট এই ঋণকে মাকসুদুর রহমানের বেনামি ঋণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মাকসুদুর রহমান সাউথ বাংলা ব্যাংকের পরিচালক ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর বেনামি ঋণসহ ব্যাংকটির গুলশান ও পুরান ঢাকার ইমামগঞ্জ শাখার ২৫৮ কোটি টাকার ঋণে গুরুতর অনিয়ম পেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।[২৫] বছর দুয়েক আগে তাঁর মালিকানাধীন রতনপুর গ্রুপের নামে থাকা ৬টি ব্যাংকে ৯২৮ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠনের মাধ্যমে কম সুদ ও অন্যান্য সুবিধা পেলেও ওই ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ এখন খেলাপি।[২৬]

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালক কামরুন নাহার সাখী। দেশের ৯টি ব্যাংক থেকে সিলভিয়া গ্রুপের নামে হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে উধাও শিপ ব্রেকিং ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান শাহীনের স্ত্রী তিনি। সিলভিয়া গ্রুপের নামে নেয়া অনেক ঋণ ইতিমধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে। সাখী সিলভিয়া গ্রুপের একজন পরিচালক।[২৭]

বাংলাদেশ ব্যাংকের বরাত দিয়ে নিউ এইজ জানাচ্ছে, সেপ্টেম্বর ২০১৬ নাগাদ ব্যাংক পরিচালকদের ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৮ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা, যা মোট ব্যাংক ঋণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯৮৭ কোটি টাকার ১৩.৯৬ শতাংশ। ৪৬টি ব্যাংকের ৫০ থেকে ৭০ জন পরিচালক এই ঋণ পকেটস্থ করেছেন।[২৮] সেপ্টেম্বর ২০১৭-তে ব্যাংক পরিচালকদের এই ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫২৯ কোটি টাকা, ব্যাংক খাতের সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে যা ১৯.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে চার হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ।[২৯] এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, ব্যাংকের পরিচালকরা পরস্পর যোগসাজশ করে ঋণ দেয়ার ফলেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হল ব্যাংক পরিচালকদের এই বেপরোয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণে অর্থমন্ত্রীর অপারগতা প্রকাশ– 'কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব জানি না।'[৩০]

> বেসিক ব্যাংকের প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারির পেছনে সরকার গঠিত পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিচালনা পর্ষদ আইন বিধিমালা ইত্যাদি কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি, ইচ্ছামত হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

ব্যাংক ঋণ নিয়ে পাচার ও বিদেশ পাড়ি

ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করে পুঁজি পাচার ও বিদেশে পাড়ি দেয়ার ঘটনা বহু। ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বণিক বার্তায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায়, শুধু চট্টগ্রামেরই ১৯ ঋণখেলাপি এরই মধ্যে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। বকেয়া ঋণ রেখে বিদেশে পাড়ি দেয়া চট্টগ্রামের ১৯ ব্যবসায়ীর কাছে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। এসব ব্যবসায়ীর মধ্যে ১০ জনই বসবাস করছেন কানাডায়। চারজন পাড়ি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যরা আছেন মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ায়। এর মধ্যে :

– জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিমের মালিকানাধীন ক্রিস্টাল গ্রুপের তিন কর্ণধার বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা বকেয়া রেখে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন;

– ইয়াছির গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইয়াছির এন্টারপ্রাইজ ও শাপলা ফ্লাওয়ার মিলসের নামে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ১০০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ রেখে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মোজাহের হোসেন ২০১৪ সালে সপরিবারে কানাডায় পাড়ি দেন;

– শিপ ব্রেকিং কোম্পানি ম্যাক ইন্টারন্যাশনালের নামে ৮০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ রেখে ২০১২ সাল থেকে জয়নাল আবেদিন সপরিবারে কানাডায় এবং জামিল আবেদিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়

বসবাস করছেন;
– ৬০০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ না করে শাহ আমানত আয়রন মার্টের স্বত্বাধিকারী গিয়াস উদ্দিন কুসুম সপরিবারে কানাডায় বসবাস করছেন;
– ভোগ্যপণ্য আমদানিকারী ইফফাত ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী দিদারুল আলম বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ২০০ কোটি টাকা খেলাপি করে ২০১৬ সালের অক্টোবরে কানাডায় পাড়ি দিয়েছেন;
– রড-সিমেন্টসহ নির্মাণ খাতের মওলানা গ্রুপের বর্তমান কর্ণধার এ এইচ এম শোয়াইব ছয় ব্যাংকের পাওনা প্রায় ১৫০ কোটি টাকা পরিশোধ না করেই ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছেন;
– শিপ ব্রেকিং কোম্পানি ফরচুন স্টিলের মালিক শরফুদ্দিন আহমদ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ রেখে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন;
– পণ্য পরিবহন ও কেমিক্যাল আমদানিকারক সার্ক ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক চৌধুরী প্রায় ১০০ কোটি টাকা বকেয়া ঋণ রেখে সপরিবারে মালয়েশিয়ায় পাড়ি দিয়েছেন;
– ভোগ্যপণ্য ও কেমিক্যাল ব্যবসায়ী আরএস এন্টারপ্রাইজের শওকত আলী বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ৫০ কোটি টাকার ঋণ খেলাপি করে কানাডায়;
– ইস্পাত, শিপ ব্রেকিং ও আবাসন খাতের মিশম্যাক গ্রুপের তিন কর্ণধার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেয়া প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ঋণ খেলাপ করে ২০১২ সালে কানাডা ও সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমিয়েছেন।[৩১]

ব্যাংক ঋণ নিয়ে এভাবে প্রতিবছর ঠিক কতজন বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন এবং তাঁদের খেলাপি ঋণের ঠিক কত অংশ বিদেশে পাচার করেছেন, তার কোন সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায় না। তবে দেশ থেকে প্রতিবছর যে হাজার হাজার কোটি টাকা নানাভাবে বিদেশে পাচার হয় তার মধ্যে এই ব্যাংক ঋণের নামে লুণ্ঠনের টাকাও যে রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ২০১৭ সালে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী দেশটির ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা রাখা অর্থের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় নিবাস বা সেকেন্ড হোম নির্মাণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণের তালিকায় বাংলাদেশিরা তৃতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটি বা জিএফআইর হিসাব অনুসারে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা।[৩২]

ব্যাংক লুটে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা:

ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

যেহেতু স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে ব্যাংকে জমা পড়া জনগণের হাজার কোটি টাকার আমানত ঋণ দেয়ার নামে লুটপাট করা যায়, সে কারণে ৯০ শতাংশের বেশি পুঁজির জোগানদার যে সাধারণ জনগণ, তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে ব্যাংক পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ স্রেফ প্রাথমিক বিনিয়োগকারী মালিকগোষ্ঠীর হাতে থাকা নিরাপদ নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে জনগণের আমানতের টাকা নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ থেকে যায়। সে কারণেই এ ক্ষেত্রে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের ব্যবস্থা থাকা, পেশাদার পরিচালক/ব্যবস্থাপক থাকা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি ইত্যাদি নিশ্চিত করা জরুরি।

বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংকে একের পর এক জালিয়াতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটার পরও এই নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি প্রতিষ্ঠার বদলে উল্টো ব্যাংক মালিকদের হাতে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের সুযোগ অবারিত করা হয়েছে রীতিমত আইন সংশোধন করে। ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে 'ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) বিল ২০১৭' পাস হয়। ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধনীর ফলে বেসরকারি ব্যাংকে একই পরিবার থেকে এখন চারজন পরিচালক হতে পারবেন। আর তাঁদের মেয়াদ হবে টানা ৯ বছর। এর আগে কোন বেসরকারি ব্যাংকে এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ দুজন পরিচালক হতে পারতেন। আর তিন বছর করে দুই মেয়াদে ছয় বছর পরিচালক থাকার পর তিন বছর বিরতি দিয়ে আবারও পরিচালক হওয়ার সুযোগ ছিল।

সংসদে বিলটি পাস হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করে স্বতন্ত্র সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী বলেছিলেন, বিলটি তাঁদের বিস্মিত করেছে। ব্যক্তিস্বার্থে পাঁচবার এই আইন সংশোধন হয়েছে। জনস্বার্থের জন্য নয়। টানা ৯ বছর পরিচালক থাকার পর তিন বছর বিরতি দিয়ে আবার পরিচালক হওয়া যাবে। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার কৌশল। কয়েকজন লুটেরার জন্য আইন সংশোধন করা ঠিক হবে না।[৩৩]

> বাংলাদেশের প্রতিটি ব্যাংকের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মাত্র ১০ শতাংশ সব মালিক বা শেয়ারহোল্ডার মিলে পরিশোধিত মূলধন হিসেবে দিয়ে থাকেন। বাকি ৯০ শতাংশ জনগণের আমানত থেকে সংগৃহীত। প্রকৃত অর্থে জনগণের টাকায় ব্যাংক চলে, কিন্তু ব্যাংক পরিচালনায় আমানতকারীর অংশগ্রহণ নেই, বোর্ডে তাদের কোনো পরিচালক নেই। এ সুযোগেই জনগণের অর্থ ব্যবহার করে মালিক-পরিচালকরা ফুলেফেঁপে ওঠেন।

বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) কয়েক বছর ধরে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের আপত্তি উপেক্ষা করে এই আইন পাসের মধ্য দিয়ে মূলত বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মালিকদের দাবিই মেনে নেয়া হয়।

অনিয়ম দুর্নীতির প্রশ্রয়

কোন অনিয়ম, দুর্নীতি কিংবা লুটপাটে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আছে কি না, ক্ষমতাসীনরা এই সব লুণ্ঠনের সুবিধাভোগী কি না তা বোঝার একটি মাপকাঠি হল ওই অপরাধের যথাযথ তদন্ত ও মূল অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার হল কি হল না তা খতিয়ে দেখা। গত এক দশকে যত ব্যাংক লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে তার একটিরও যথাযথ তদন্ত করা হয়নি, দায়সারা তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও একটিরও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি, প্রবল সমালোচনা ও গণরোষের কারণে দায়ীদের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও মূল হোতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধরাছোঁয়ার বাইরে, যারা ধরা পড়েছে তাদেরও কোন সাজা হয়নি। বছরের পর বছর মামলা চলছে। অভিযুক্তদের কেউ জেলে আছে, কেউ চিকিৎসার নামে হাসপাতালে আরাম-আয়েশে। অনেকে জামিন পেয়েছে। কেউ বা পালিয়ে লাপাত্তা। কিন্তু সুরাহা হয়নি কোন ঘটনার। লুণ্ঠিত অর্থও ফেরত আসেনি।[৩৪]

ফেব্রুয়ারি ২০১৬-তে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ

ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ১০ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চলে যায় ফিলিপাইনে আর দুই কোটি ডলার যায় শ্রীলঙ্কায়। রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিনকে প্রধান করে ১৫ মার্চ তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। ৩০ মে ২০১৬-তে সেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার সময় ফরাসউদ্দিন বলেছিলেন, এই চুরির পেছনে দেশের বাইরের কারা দায়ী, দেশের ভেতরে কারা জড়িত এবং চুরি যাওয়া অর্থের কতটা উদ্ধার করা সম্ভব তা সবই তদন্ত প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে।[৩৫] অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২২ সেপ্টেম্বর সেই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা দিলেও চুরি যাওয়া অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে–এই অজুহাতে সেই তদন্ত প্রতিবেদন আর প্রকাশ করা হয়নি।[৩৬]

বহুল আলোচিত হলমার্ক গ্রুপের জালিয়াতির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ২ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা আত্মসাতের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। এ বিষয়ে সরকারের কাছে তারা কোন সুপারিশ করতেও অস্বীকৃতি জানায়।[৩৭] হলমার্ক গ্রুপের বিরুদ্ধে করা এক মামলার বিচারে তিন বছরে ৪০ বার সময় নেয়া হয়। হলমার্কের চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামের জামিন বাতিলেরও কোন আবেদন জানায়নি বাদী প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।[৩৮]

বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর অনিয়ম-দুর্নীতির কথা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক–কারোরই অজানা ছিল না। কিন্তু দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে :

> এক দশক আগে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইব্রাহিম কটন মিল বিক্রি করে গড়ে তোলেন ক্রিস্টাল গ্রুপ নামে নতুন প্রতিষ্ঠান। এরপর বিভিন্ন ব্যাংক থেকে একের পর এক ঋণ নিতে থাকেন। সেসব ঋণের অর্থ ফেরত না দিয়ে উল্টো বিভিন্ন ব্যাংকের মালিকনা অর্জন করেছেন। অনিয়ম-দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিম।

প্রথম দফায় ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিন বছরের জন্য চেয়ারম্যান হয়েই আবদুল হাই অনিয়ম-দুর্নীতি শুরু করেন। তাঁর প্রথম অপকীর্তি ২০১০ সালের শুরুতেই। সেটা হচ্ছে ব্যাংকের জন্য ভবন কেনার নামে। সিঙ্কু আকরামুজ্জামান নামের একজনের সঙ্গে ৮০ কোটি টাকার চুক্তি করেন এবং চুক্তির দিনই তাঁকে ৪০ কোটি টাকা নগদ দিয়ে দেয়া হয়। বাকি টাকা ব্যাংক পরে দেয়। টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তি মালয়েশিয়ায় চলে যান। বেসিক ব্যাংক এখনও সেই ভবন বুঝে পায়নি।

এভাবে একের পর এক অনিয়মে একটানা পাঁচ বছরে ব্যাংকটিকে প্রায় শেষ করে দেন আবদুল হাই। ২০১৪ সালের আগস্টে ব্যাংকটির পর্ষদ ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্তের দুই দিন আগে শুক্রবার ছুটির দিনে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বাসায় গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন আবদুল হাই। আর এভাবেই সরকার 'সম্মানের' সঙ্গে তাঁকে বিদায়ের সুযোগ করে নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১১ সালেই আবদুল হাইয়ের দুর্নীতির প্রমাণ পায় এবং ২০১২ সালে শান্তিনগর, গুলশান ও দিলকুশা শাখা পরিদর্শন শেষে একটি প্রতিবেদন পাঠায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে। অর্থ মন্ত্রণালয় তখন নীরব থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ২০১৪ সালে আবদুল হাইয়ের কোন ব্যাংক হিসাবে কত টাকা কিভাবে জমা হয়, তার বিবরণও দুদককে জানিয়েছিল। কিন্তু দুদক তা আমলে নেয়নি।[৩৯]

বেসিক ব্যাংকের কেলেঙ্কারির সময়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সব নিরাপদে আছেন। তাঁরা ঘুরছেন-ফিরছেন, স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। পদ-পদোন্নতি দিয়ে সরকার উল্টো তাঁদের পুরস্কৃতও করেছে। আর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) যেসব ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে, তাঁরা সবাই জামিনে। আদালত থেকে জামিন পেয়ে তাঁদের কেউ দেশে আছেন, কেউ বা জামিন পাওয়ার দিনই পালিয়ে চলে গেছেন বিদেশে। আর পর্ষদের হুকুম তামিল করা ব্যাংকাররা সবাই জেলে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের অন্যতম প্রধান এই আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনায় যাঁর প্রধান দায় রয়েছে বলে অভিযোগ আছে, সেই আবদুল হাই বাচ্চু রয়েছেন বহাল তবিয়তে।[৪০]

বিসমিলাহ গ্রুপের প্রায় ১২০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং ও দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের করা ১২ মামলার মূল হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ মামলার আসামিদের কেউ কেউ এখনও ব্যাংকের চাকরিতে বহাল রয়েছেন। আবার কেউ পদোন্নতি পেয়েছেন। তবে বিগত ৫ বছরেও এ মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ হয়নি। বড় ঋণ জালিয়াতির হোতারা এখনও অধরা।[৪১]

তদারকির লাগাম টেনে ধরা

বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা ও তদারক করা। পাশাপাশি যে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে, তা যথাযথ কাজে ও নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা তদারক করাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। এ জন্য ব্যাংক ও ঋণ প্রকল্প পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হয়। পরিদর্শনের সময় ঋণের ব্যবহার, প্রকল্পের অস্তিত্ব, মূল্য পরীক্ষা করতে হয়, ঋণের জামানত ও নথিপত্র দেখতে হয়। ব্যাংক শাখা পরিদর্শনের সময় কোন বিশেষ ঋণের বিষয়ে সন্দেহ হলে বা অপব্যবহারের তথ্য থাকলে সংশিষ্ট পরিদর্শক নথিপত্র সংগ্রহ করে থাকেন। এরপর প্রয়োজন হলে সংশিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে প্রকল্পও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে ঋণ অপব্যবহারের তথ্য মিললে বিভিন্ন মানে শ্রেণীকৃত করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ তদারকির কাজ যথাযথভাবে পালন করছে না বা করতে পারছে না। নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করা ব্যবসায়ীরাই ঠিক করেন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন পদে কারা আসবেন।[৪২] কিন্তু এর মধ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে ধরা পড়া অনিয়মগুলোর মধ্যে অন্যতম হল হলমার্ক, বিসমিলাহ গ্রুপ, আনন্দ শিপইয়ার্ড কেলেঙ্কারি, বেসিক, ফারমার্স ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের অনিয়ম। কিন্তু এই তদন্ত ও পরিদর্শনেও লাগাম টেনে ধরার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন নীতিমালায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এত দিন পরিদর্শন কর্মকর্তারাই ঋণ শ্রেণীকৃত করতে পারতেন। কিন্তু ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে পরিদর্শন নীতিমালায় যে পরিবর্তন আনা হয় তার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে ঋণ অপব্যবহারের চিত্র পেলেও তা আর শ্রেণীকৃত (খেলাপি) করতে পারবেন না। সংশিষ্ট ঋণ খেলাপি করতে হলে তদারকি বিভাগের ডেপুটি গভর্নরকে অবহিত করতে হবে। এর পরই ওই ঋণের বিষয়ে

সিদ্ধান্ত হবে। ঋণের অনিয়ম যে হারে বেড়েছে, সে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন কার্যক্রম বা তদারকি বাড়েনি। এখন ঋণ অপব্যবহারের তথ্য পাওয়ার পর সেগুলো শ্রেণীকৃত করতে ডেপুটি গভর্নরের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে ডেপুটি গভর্নরের একার পক্ষে সারা দেশের ১০ হাজার শাখার ঋণের তদারকি যথাযথভাবে করা সম্ভব হবে না, ফলে অনিয়ম আরও বেড়ে যাবে।[৪৩] বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, একের পর এক ব্যাংক কেলেঙ্কারির যুগে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কাদের স্বার্থরক্ষার্থে নেয়া হয়!

লাগামহীন খেলাপি ঋণ ও ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা

২০১৬ সালের মার্চে দেশে খেলাপি ঋণ ছিল ৫৯ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। এক বছর পর ২০১৭ সালের মার্চে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে খেলাপি ঋণ হয় ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।[৪৪] তার এক বছর পর ২০১৮ সালের মার্চে খেলাপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ১০.৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ এই এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৫ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। এর সাথে অবলোপন করা ৪৮ হাজার ১৯২ কোটি টাকা যোগ করলে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৩৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত ৯ বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪ গুণ।[৪৫] এসব ঋণ সাধারণ মানুষ খেলাপ করেনি। ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা কতিপয় বিশেষ গোষ্ঠী/গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর জন্য দায়ী। খেলাপি ঋণের প্রায় ৪০ শতাংশই ব্যাংকগুলোর শীর্ষ ২০ জন করে খেলাপি গ্রাহকের কাছে রয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকে শীর্ষ ২০ জন করে খেলাপি গ্রাহকের কাছে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাবে আটকা পড়েছে ৩২ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা।[৪৬]

> ব্যাংকের মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে ঋণের নামে জনগণের আমানতের অর্থ লুণ্ঠন করা হয়, তার একটি বড় দৃষ্টান্ত হল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এস আলম গ্রুপের হাতে ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা আসার মাত্র ১৫ মাসের মাথায়ই তীব্র আর্থিক সংকটে পড়ে যায় ব্যাংকটি।

মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে ব্যাংক মালিক/পরিচালকদের সাথে যোগসাজশে, ঘুষ, দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী এই বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে আর পরিশোধ করছে না। জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা এসব ঋণ খেলাপির হাত থেকে উদ্ধার করা এবং এদের শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা উল্টো এদের বছর বছর ঋণ পুনঃ তফসিল, এমনকি সহজ শর্তে, তুলনামূলক কম সুদে ও দীর্ঘ মেয়াদে পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করা হয়।

বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ২০১৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে গ্রুপের সব ঋণ পুনর্গঠন করার দাবি জানিয়েছিলেন। এরপর অন্য ব্যবসায়ীরাও একই দাবি জানালে ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ পুনর্গঠনের নীতিমালা জারি করে। ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণগ্রহীতাদের জন্য এই সুযোগ দেয়া হয়। নীতিমালা অনুযায়ী, দুই কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী খেলাপি হয়ে যাবে। এসব ঋণ আদায়ে দেউলিয়া আইন ১৯৯৭-এর আওতায় মামলা করতে পারবে ব্যাংক। ২০টির মত প্রতিষ্ঠান ঋণ পুনর্গঠনের আবেদন করলেও ১১ গ্রুপ এই সুবিধা পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ১৫ হাজার ২১৮ কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠনের অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপেরই ছিল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। সুবিধা পাওয়া অন্য গ্রুপগুলো হল যমুনা, শিকদার, কেয়া, এ্যাননটেক্স, রতনপুর, এসএ, বিআর স্পিনিং, রাইজিং গ্রুপ ও অন্যান্য।[৪৭]

ভয়ংকর ব্যাপার হল, পুনর্গঠন সুবিধা নিয়েও এসব ব্যবসায়ীর বড় অংশ নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেনি। বিশেষ সুবিধা পাওয়া এই বড় ব্যবসায়ীরা নতুন করে খেলাপি হয়ে পড়েছেন। ঋণ তো পরিশোধ করছেনই না, বরং তাঁরা আরও নতুন ঋণ ও সুদ মওকুফ চাইছেন। ২০১৫ সালে ঋণ পুনর্গঠন হলেও এসব ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধ শুরু হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। বেক্সিমকো গ্রুপ, নারায়ণগঞ্জের এমআর গ্রুপ, চট্টগ্রামভিত্তিক এসএ গ্রুপ, রতনপুর গ্রুপ, কেয়া গ্রুপ কিস্তি পরিশোধ করেনি। ফলে এসব গ্রুপের নাম নতুন করে খেলাপির তালিকায় উঠেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, উল্টো তারা আবারও নতুন করে সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করছে।[৪৮]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এসব গ্রুপ ঋণ পরিশোধ না করলেও মুনাফা কিন্তু ঠিকই করছে। যেমন: ১৫ হাজার কোটি টাকার পুনর্গঠিত ঋণের মধ্যে বেক্সিকোর ঋণই ৫ হাজার কোটি টাকা। কোম্পানিটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২৬২ কোটি টাকা আয় করেছে আর মুনাফা করেছে ১০১.৭৯ কোটি টাকা। ঋণ পুনর্গঠনের পর থেকে দুই কিস্তিতে মাত্র ১১৪.৮ কোটি টাকা পরিশোধ করার পর আর কিস্তি পরিশোধ করেনি। সোনালি ব্যাংকের কাগজপত্র অনুযায়ী সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ করেছে ২০১৭ সালের মার্চে। উল্টো বেক্সিমকো গ্রুপ ঋণের সুদের হার আরও কমিয়ে ১০ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ করার আবদার করে এবং প্রথম কয়েক বছর শুধু সুদের টাকা পরিশোধ করে পরবর্তীতে ঋণের টাকার কিস্তি পরিশোধের সুবিধা দাবি করে।[৪৯]

লুটপাটের বেইল আউট

বেপরোয়া লুটপাটের শিকার হয়ে সর্বজনের ব্যাংকগুলো ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণেও ব্যর্থ হচ্ছে। মূলধন ঘাটতি পূরণে বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোয় জনগণের অর্থ ঢালছে সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এমন কোন বছর নেই, যে বছর মূলধন বাবদ ব্যাংকগুলোকে টাকা দিতে হয়নি। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ বছরে দেয়া হয়েছে ১৪ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা।[৫০] কিন্তু এর পরও ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী সোনালী, জনতা, রূপালী ও বেসিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) মূলধন ঘাটতি ছিল ১৫ হাজার ৯০৯ কোটি টাকা। এরপর তিন মাসের ব্যবধানে ১৫৩১ কোটি টাকা বেড়ে মূলধন ঘাটতি দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা।[৫১]

সরকার একদিকে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকে সরাসরি জনগণের করের টাকা বরাদ্দ দিচ্ছে, অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের লুটপাটের শিকার ব্যাংকগুলোকে নানান নীতি সুবিধার মাধ্যমে বেইল

আউট করছে, যা আসলে লুটপাটের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আর কিছুই না।

যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো নিজেরাই মূলধন ঘাটতিতে রয়েছে, তাদেরই আবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে লুটপাটে বিপর্যস্ত বেসরকারি ফারমার্স ব্যাংকে মূলধন জোগান দিতে। এ জন্য সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক ১৬৫ কোটি টাকা করে এবং ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) ৫৫ কোটি টাকা, সব মিলিয়ে ফারমার্স ব্যাংকে ৭১৫ কোটি টাকা মূলধন জোগান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঁচটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।[৫২] এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক বিশেষ আদেশ জারি করে–এক ব্যাংকের কাছে অন্য কোন ব্যাংকের ১০ শতাংশের বেশি মালিকানা না থাকা কিংবা একই সাথে একাধিক ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে না থাকার যে বাধ্যবাধকতা ছিল ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুসারে, সেসব থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[৫৩]

লুটপাটের শিকার বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে বেইল আউট করতে সরকার জনগণের অর্থ আরও বেশি পরিমাণে বেসরকারি ব্যাংকে জমা রাখার অর্থাৎ লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছে। যে কোন সরকারি সংস্থা এত দিন তার তহবিলের ৭৫ শতাংশ অর্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে জমা রেখে আসছিল। বাকি ২৫ শতাংশ পর্যন্ত রাখত তারা বেসরকারি ব্যাংকে। দীর্ঘ সময়ের এই চর্চা পাল্টে সরকারি সংস্থার তহবিল রাখার নতুন হার করা হল অর্ধেক অর্ধেক। অর্থাৎ এসব তহবিলের ৫০ শতাংশ সরকারি ব্যাংকে রাখলেও বাকি ৫০ শতাংশ রাখতে হবে বেসরকারি ব্যাংকে। শুধু তা-ই নয়, সব ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে বাধ্যতামূলক নগদ জমার হার (সিআরআর) রাখতে হয়, তা-ও ৬.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ কমিয়ে ৫.৫ শতাংশ করেছে সরকার। মুদ্রানীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে সিআরআর। বিশ্বের সব কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও গভীর বিশ্লেষণের পর এই হার নির্ধারণ করে থাকে। আর বাংলাদেশে এই কাজ হয়েছে হোটেলে ব্যাংক মালিকদের সঙ্গে বসে, মুখোমুখি আলোচনার মধ্য দিয়ে। এই সিআরআর কমানোর কারণে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর হাতে যাবে এখন প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।[৫৪]

উপসংহার

ব্যাংক খাত হল এমন একটা প্রিজম, যার মধ্য দিয়ে দেখলে কোন দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চরিত্রটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের মধ্যে পরিবারতান্ত্রিক ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো চমৎকার ফুটে ওঠে। পল হাচক্রাফট ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ব্যাংকিং খাতের যে বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দিলে রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীতন্ত্রের সম্পর্ক বুঝতে সুবিধা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম। এ বিষয়ে খোঁজখবর রাখলে বোঝা যায় কিভাবে লুটেরা গোষ্ঠীতন্ত্র রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানান সুবিধা আদায় করে।[৫৫]

বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোর সাথে পরিবারতান্ত্রিক ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজিপতিদের সম্পর্ক পারস্পরিক মিথোজীবিতার, একটি আরেকটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে, একের আদলে ও প্রয়োজনে অপরের গঠন ও বিকাশ। লুটেরা পুঁজিপতিদের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বাধীন গণমাধ্যম, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, জবাবদিহি, স্বাধীন নির্বাচনব্যবস্থা ইত্যাদি খুবই বিপজ্জনক।[৫৬] তাই এই লুটেরা গোষ্ঠী ও ক্ষমতায় যাওয়া তাদের প্রতিনিধি শাসকরা এমন কোন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি, যার মাধ্যমে অবাধ লুণ্ঠনে রাশ টানা যায়।

ফলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অন্য সকল খাতের মত ব্যাংক খাতেও কোন প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন গড়ে ওঠেনি। কোন ব্যাংক চালু হবে কি না, লাইসেন্স পাবে কি না, টিকে থাকবে কি না তার অনেকখানিই নির্ভর করে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আশীর্বাদ পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর। বেসরকারি ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান থেকে শুরু করে সরকারি সঞ্চয়, ঋণ, জরুরি সহায়তা বা বেইল আউট ইত্যাদি যেসব মূল্যবান সুবিধা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বরাদ্দ করে তার খুব কমই নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক কোন নীতিমালার মাধ্যমে দেয়া হয়।

ফিলিপাইনের গোষ্ঠীতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজিবাদের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পল হ্যাচক্রাফট দেখেছিলেন- অবাধ পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের পরিবারতান্ত্রিক/গোষ্ঠীতান্ত্রিক চেহারাটি স্পষ্ট হয়। গোষ্ঠীতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজিবাদে ব্যবসায়িক জগতের মৌলিক কাঠামোটি বিভিন্ন পারিবারিক বৃহৎ ব্যাবসায়িক গ্রুপের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো থাকে। এসব বৃহৎ ব্যবসায়িক গ্রুপের প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার নিশ্চিততম উপায় হল একটি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আংশিক বা সম্পূর্ণ মালিকানা থাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি কখনও ব্যাংকের আমানত লুণ্ঠনকারী ব্যাংকার ও ব্যাংক মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেয়, তাহলে দেখা যায় ক্ষমতাবান ব্যাংকার ও ব্যাংক মালিকরা শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলো কাজে লাগায়, যা এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫৭]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, সরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থান করা ব্যক্তিদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অন্যদিকে পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের জন্য ব্যাংকের মালিকানা অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকের মালিকপক্ষের বিভিন্ন পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ঘুষ, দুর্নীতি, জালিয়াতির মাধ্যমে বিতরণ করা এসব ঋণের বেশির ভাগই আর আদায় হয় না। এমনকি ব্যাংকগুলো আদালতে মামলা করেও প্রভাবশালী ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে খেলাপি ঋণ আদায় করতে পারে না। এসব খেলাপি গ্রাহকরা শ্রেণীকরণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে শ্রেণীকরণের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে অন্য ব্যাংক থেকে নতুন নতুন ঋণ গ্রহণ করে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে স্বীকার করা হয়, "সরকারি মালিকানাধীন ১৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণখেলাপিরা উচ্চ আদালতে দুই হাজার ৫১২টি রিট করে রেখেছেন। তাঁদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৩০ হাজার ১৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকা।"[৫৮]

বাংলাদেশের ব্যাংক লুণ্ঠন বা কেলেঙ্কারি নামক মেগাসিরিয়ালের পর্বগুলো লক্ষ করলে লুণ্ঠনের প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও প্রবণতা এবং দায়মুক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতার ধরন বিশ্লেষণ করলে এই কেলেঙ্কারিগুলোর একটা কাঠামোগত আদল স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা দেশের পুঁজি গঠনের ধরন, আর্থিক খাত ও ব্যাংকিং সেক্টরের গঠন এবং লুটেরা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ফলে জনগণের দিক থেকে প্রবল ও সংগঠিত প্রতিরোধ ছাড়া লুটপাটের এই মেগাসিরিয়ালের সমাপ্তি ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।

কল্লোল মোস্তফা: প্রকৌশলী, লেখক
ইমেইল: kallol_mustafa@yahoo.com

তথ্যসূত্র

১) `Trends in the Repayment Performance to the DFIs : Implications for the Development of Entrepreneurship in Bangladesh' by Rehman Sobhan and Binayak Sen, *The Bangladesh Development Studies*, Vol. 17, No. 3 (September 1989), pp. 21-66

২) পূর্বোক্ত

৩) 'দেশ কার হাতে', আনু মুহাম্মদ, *সামরিক শাসনের দশকে*, নবরাগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃষ্ঠা ৭১-৮০

৪) পূর্বোক্ত

৫) 'ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ', আনু মুহাম্মদ, *সামরিক শাসনের দশকে*, নবরাগ প্রকাশনী, ২০১১, পৃষ্ঠা ৯১

৬) *জাতীয় বাজেট বক্তৃতা: জিয়া/সাইফুর পর্ব*, লিরিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০২, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৮১

৭) 'খেলাপি ঋণ বাড়ল আরও ১৫ হাজার কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ৪ জুন ২০১৮

৮) 'একক ঋণে বৃহত্তম কেলেঙ্কারি: অভিযোগ ছিল গাড়ি চুরির, এখন বড় শিল্পপতি', ১১ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*

৯) 'হাজার কোটি টাকা লুট করে অদৃশ্য টিপু সুলতান', ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, *বণিক বার্তা*

১০) 'আমার ছেলে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখত', *প্রথম আলো*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

১১) 'মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে হলমার্ক গ্রুপ', *কালের কণ্ঠ*, ১৪ অক্টোবর ২০১২

১২) 'সোনালী ব্যাংক রূপসী বাংলা শাখা: ফন্দিফিকির করে ২ হাজার কোটি টাকা আদায়', *প্রথম আলো* , ২৪ মে ২০১২

১৩) '১১০০ কোটি টাকা হাতিয়ে দেশ থেকে লাপাত্তা', ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, *প্রথম আলো*

১৪) 'ঋণের নামে ৩ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেল ক্রিসেন্ট', ৫ এপ্রিল ২০১৮, *সমকাল*

১৫) 'হলমার্ককে ছাড়িয়ে গেছে বেসিক ব্যাংক: সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারি', ২০ আগস্ট ২০১৩, *প্রথম আলো*

১৬) 'ব্যাংক ডুবিয়ে জাহাজ ভাসালেন তিনি', ২ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*

১৭) 'পরিবারতন্ত্রের স্বার্থে ব্যাংকিং আইন সংশোধনী', খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, ১৪ অক্টোবর ২০১৭, *প্রথম আলো*

১৮) 'নাজমুলও ব্যাংক উদ্যোক্তা!', ২১ ডিসেম্বর ২০১৭, *বণিক বার্তা*

১৯) 'ফারমার্সের ঘাটতি ২৮৩ কোটি টাকা', ২৮ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*

২০) 'ঋণ দিয়ে ১৪৫ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন বাবুল চিশতী', ৪ এপ্রিল ২০১৮, *সমকাল*

২১) 'ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক', *বণিক বার্তা*, ১৫ জানুয়ারি ২০১৮

২২) 'মালিকানা বদলের পর ১৫ মাসেই ইসলামী ব্যাংক সংকটে', ২৫ এপ্রিল ২০১৮, *প্রথম আলো*

২৩) *ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইন (সংক্ষিপ্তসার)*, বাংলাদেশ ব্যাংক, পৃষ্ঠা ৮

২৪) 'ঋণ পাচ্ছেন খেলাপিরা, পরিচালক পদেও বহাল', ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, *প্রথম আলো*

২৫) 'অন্যের নামে ঋণ নিয়েছেন ব্যাংকের পরিচালক', ১৫ মার্চ ২০১৮, *সমকাল*

২৬) 'ব্যাংক পরিচালকরাই চার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি', ৫ মার্চ ২০১৮, *সমকাল*

২৭) 'ব্যাংক পরিচালকরাই চার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি', ৫ মার্চ ২০১৮, *সমকাল*; 'ঋণ পাচ্ছেন খেলাপিরা, পরিচালক পদেও বহাল', ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, *প্রথম আলো*

২৮) `Directors swallow Tk 88,790cr as credit from each other's banks,' ৬ ডিসেম্বর ২০১৬, *নিউ এইজ*

২৯) 'ব্যাংক পরিচালকরাই চার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি', ৫ মার্চ ২০১৮, *সমকাল*; 'ঋণের টাকা যাচ্ছে ব্যাংক পরিচালকদের পকেটে', ১২ জানুয়ারি ২০১৮, *বাংলা ট্রিবিউন*; Bank directors' non-performing loans stand at Tk 4000 cr, ১২ মার্চ ২০১৮, *ডেইলি অবজারভার*

৩০) 'অসহায় অর্থমন্ত্রী', ১৫ মে ২০১৮, *প্রথম আলো*

৩১) 'ঋণখেলাপিরা কানাডা যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দিচ্ছেন', ২২ এপ্রিল ২০১৮, *বণিক বার্তা*

৩২) 'অর্থ পাচার রোধ : সরকারের কি সদিচ্ছার অভাব?', ২২ জুলাই ২০১৭, *বিবিসি বাংলা*

৩৩) 'ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনী পাস, জাপার ওয়াক আউট', ১৬ জানুয়ারি ২০১৮, *প্রথম আলো অনলাইন*

৩৪) 'ব্যাংকের টাকায় হরিলুট: অর্থ কেলেঙ্কারির সুরাহা নেই', ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, *ভোরের কাগজ*

৩৫) 'রিজার্ভ চুরির চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা', ৩০ মে ২০১৬, *প্রথম আলো*

৩৬) 'তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় প্রশ্ন', ৪ অক্টোবর ২০১৬, *প্রথম আলো*

৩৭) 'হলমার্ক কেলেঙ্কারি: তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে না সংসদীয় কমিটি!', ১৭ মে ২০১৩, *প্রথম আলো*

৩৮) 'সমঝোতায় বিলম্বিত হলমার্কের বিচার', ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, *যুগান্তর*

৩৯) 'জেনেশুনে নীরব ছিল সবাই', ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, *প্রথম আলো*

৪০) 'পরিচালক পুরস্কৃত, ব্যাংকার জেলে, ব্যবসায়ী পলাতক', ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, *প্রথম আলো*

৪১) 'বিসমিল্লাহ গ্রুপের ঋণ জালিয়াতি: ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল হোতারা', ১২ মার্চ ২০১৮, *ভোরের কাগজ*

৪২) 'খেলাপি ঋণ লাগামহীন', ১৭ মে ২০১৭, *প্রথম আলো*

৪৩) 'কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ক্ষমতায় লাগাম টানল কেন্দ্রীয় ব্যাংক', ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, *প্রথম আলো*

৪৪) 'খেলাপি ঋণ লাগামহীন', ১৭ মে ২০১৭, *প্রথম আলো*

৪৫) 'খেলাপি ঋণ বাড়ল আরও ১৫ হাজার কোটি টাকা', *প্রথম আলো*, ৪ জুন ২০১৮

৪৬) 'শীর্ষ খেলাপিদের কাছে আটকা ৪০ শতাংশ ঋণ', *প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০১৮

৪৭) 'বড় খেলাপিরা সুবিধা নিয়েও ঋণ পরিশোধ করছে না', ২৯ মার্চ ২০১৭, *প্রথম আলো*

৪৮) 'অর্ধেকই নতুন করে খেলাপি', ২৫ জুলাই ২০১৭, *প্রথম আলো*

৪৯) 'বরো মানি, নেভার পে ব্যাক', *ডেইলি স্টার*, ৮ এপ্রিল, ২০১৮

৫০) 'করের টাকা যাচ্ছে সরকারি ব্যাংকে', ৩০ মে ২০১৭, *প্রথম আলো*

৫১) 'ব্যাংকগুলোকে আবারও দেয়া হচ্ছে জনগণের টাকা', ২৮ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*

৫২) 'ক্রমশ খাদের কিনারে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক', ৪ এপ্রিল ২০১৮, *বণিক বার্তা*; 'আইনের অব্যাহতি পাচ্ছে ফারমার্স ব্যাংক', ৩০ এপ্রিল ২০১৮, *যুগান্তর*

৫৩) 'ফারমার্সের শেয়ার কিনতে ৪ ব্যাংকের বাধা কাটল', ৮ মে ২০১৮, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*

৫৪) 'চাপ দিয়ে আরও বেশি সুবিধা নিলেন ব্যাংক মালিকেরা', *প্রথম আলো*, ২ এপ্রিল ২০১৮

৫৫) Paul D. Hutchcraft লিখিত *Booty Capitalism- The Politics of Banking in the Philippines*, 1998, Cornell Universitz Press

৫৬) 'লুম্পেন কোটিপতিদের উত্থানপর্ব', আনু মুহাম্মদ, ২৮ মার্চ ২০১৮, *প্রথম আলো*

৫৭) Paul D. Hutchcraft লিখিত *Booty Capitalism- The Politics of Banking in the Philippines*, 1998, Cornell Universitz Press

৫৮) 'খেলাপিদের রিটে আটকা ৩০ হাজার কোটি টাকা', ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, *কালের কণ্ঠ*; 'অর্থঋণ মামলা: আলাদা বেঞ্চ গঠনে আইনমন্ত্রীকে মুহিতের অনুরোধ', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪